Issue cover not available

Vol. 17 | No. 1 | 1973

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

'নববাবু বিলাস' ও তৎকালীন বাঙালী সমাজ

Volume	17
Issue	1
Year	1973
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সিরাজুল ইতিহাস
Published online	June 1, 1973
DOI	10.62328/sp.v17i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v17i1.3
Pages	83-96
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

'নববাবু বিলাস' ও তৎকালীন বাঙালী সমাজ

সিরাজুল ইসলাম

Check for updates

বাঙলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের একটি সুপরিলক্ষিত ধারা এই যে, যখনই এখানে কেন্দ্রীয় শক্তির পরিবর্তন হয়েছে সাথে সাথে সে বিদায়ী শক্তির সৃষ্ট ও পুষ্ট সামাজিক শাসক শ্রেণীরও গঠন ও বিন্যাসে এসেছে সুস্পষ্ট পরিবর্তন। বিশেষ করে মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে এ পরিবর্তনের আকার ও প্রকার ছিল অত্যধিক বৈপ্লবিক ধরনের। নিয়মিত রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনের সুবিধার্থে মুর্শিদকুলী খান কতিপয় বিশাল সামন্ত পরিবার সৃষ্টি করেন। তাঁর আমলে, বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুর পর, ঐ সব সামন্ত পরিবার তাঁদের স্থানীয় শক্তি ও প্রভাব প্রয়োগ করে প্রতিবেশী হাজার হাজার ক্ষুদ্র জমিদারী, তালুক-মলুক কুক্ষিগত করে একচেটিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম করে।[১]

মুর্শিদকুলীর নীতি ছিল ছোট ছোট জমিদারীগুলোকে জড়ো করে বড় জিলা ব্যাপী জমিদারী সৃষ্টি করা। আর ইংরেজ সরকারের নীতি ছিল ঠিক এর বিপরীত, অর্থাৎ নানা অজুহাতে বিশাল জমিদারীগুলোকে ভাগ করে সহজে শাসন করা যায় এমন ছোট জমিদারী তৈরি করা।[২] ফলে ইংরেজের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে আবির্ভাব হয় এমন এক নতুন সামাজিক শক্তির যে শক্তির বৈশিষ্ট্য ছিল পূর্বতন সমাজ বিবর্তনের ধারা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেমনা আগে যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, রাজবংশ—অপসারণ প্রভৃতি কারণে যে সামাজিক পরবির্তন হতো তা মোটোমুটি সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং সামাজিক স্বীকৃতির জন্য তাদের নতুন করে চেষ্টা করতে হতোনা। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইংরেজ শাসনের ফলে যে-সব পরিবার সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করে সে-সবের অধিকাংশই ছিল মোগল অভিজাত শ্রেণীর চোখে নিতান্ত নগণ্য ও ছোটলোক; অতএব চরম অবহেলা, এমন কি, ঘৃণার পাত্র। নব্য ভদ্রলোকদের প্রতি প্রাচীন অভিজাতদের এ ধরনের উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গিই চিত্রিত হয়েছে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থের মধ্যে।

১৮২৩ সালে (অনেকের মতে ১৮২৪ সালে) 'নববাবু বিলাস' পুস্তকখানি

ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় "প্রমথনাথ শর্মা" ছদ্মনামে প্রথমে প্রকাশ করেন। প্রকাশনার পর পরই বইটি একটি উচ্চমানের সামাজিক ব্যঙ্গ-রচনা হিসেবে সমাদৃত হয়। আবালবৃদ্ধ বনিতার মধ্যে বইটির জনপ্রিয়তাই উৎসাহদান করে প্যারীচাঁদ মিত্রকে 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখতে আর কালীপ্রসন্ন সিংহকে লিখতে 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'। দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনা কৌশলের দিক দিয়ে বিচার করলে 'নববাবু বিলাস' আধুনিক বাংলা সাহিত্যর ইতিহাসে যে এই জাতীয় প্রথম পুস্তক এ নিয়ে খুব একটা দ্বিমত নেই। কিন্তু সাহিত্যক মূল্য ছাড়াও বইটির ঐতিহাসিক মুল্যও অপরিসীম। এটা স্বীকার করতেই হবে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাঙলার সামাজিক ইতিহাস রচনার জন্য 'নববাবু বিলাস' একটি অমূল্য উপাদান। চিত্রাংকনে যদিও বইটিতে যথেষ্ট অতিরঞ্জন ও নির্মমতা আছে, কিন্তু মন-গড়া কল্পনা নেই। এখানেই এর ঐতিহাসিক মূল্য। 'ফ্রেণ্ড অব ইন্ড্রিয়া' এই পুস্তকটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

> **"It is a satirical view of the education and habits of the rich, and more especially of the families which have very recently acquired wealth and risen into notice··· The knowledge of the auother respecting the subject he handles, must necessarily be more correct than that which a foreigner could acquire, and his descriptions may therefore be received with great confidence. Though the work is highly satirical, and though some of its storks of ridicule may be too deeply touched, we cannot venture to pronounce it a caricature. Every opportuity we have enjoyed of examining the subject has confirmed us in its justness···its episodes are occasionally dull and languid, ···but with all its defects, it is a valualele document ; it illustrates the habits and economy of rich native families and affords us a glance behind the scenes."** ৩

বইটি যেহেতু সামাজিক ভাঙ্গাগড়াকে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছিল সুতরাং এর বিষয়বস্তু যথার্থভাবে অনুধাবনের জন্যে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার ফলে চিরাচরিত বঙ্গীয় সমাজ-বিন্যাসে যে রদবদল হয়েছে এখানে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক দেওয়ানী লাভের পর থেকে মোগলদের সৃষ্ট বঙ্গীয় বনেদী শ্রেণীর ক্ষমতা ও আধিপত্য ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং সে সঙ্গে তাঁদের চোখের সামনেই উদিত হতে থাকে এক নতুন প্রভাবশালী সামাজিক শ্রেণী। তখন থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত সময়কালকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে কোম্পানীর বেণিয়া মুৎসুদ্দীদের স্বর্ণযুগ। এ সময় কোম্পানীর অফিসারদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার না থাকলেও এঁরা বেনামীতে এমনকি প্রকাশ্যভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারতেন, এবং প্রায় প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ও প্রশাশনিক কর্মচারী নিজেদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য দেশীয় বেণিয়া মুৎসুদ্দী নিয়োগ করতেন। সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোম্পানীর কর্মচারীরা যেমন রাতারাতি ধনকুবের হয়ে উঠেছিল তেমনি তাদের পোষা বেণিয়া মুৎসুদ্দীরাও চোখের পলকে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠে।[৪] তাদের হঠাৎ পাওয়া ঐশ্বর্যকে সামাজিক সম্মানে রূপান্তরিত করার সুবর্ণ সুযোগ আসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর। সে যুগে জমিই ছিল সমাজের ভিত্তি। তখন যার জমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিলনা তার সামাজিক সম্মান ছিল ভূম্যধকারী সমাজের অনেক নীচে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমির সামাজিক মূল্য আরও বেড়ে গেল কেননা সে বন্দোবস্তের অধীনে জমিকে জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং বাইয়তদের পরিণত করা হয় তাদের ব্যক্তিগত প্রজা। ইচ্ছা করলেই জমিদার যে কোন প্রজাকে ভিটেমাটি ছাড়া করতে পারতেন। মোগল যুগে জমির মালিক ছিল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জমিদার রাইয়তের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। কোন রাইয়তকে খুশীমত উৎখাত করার অধিকার জমিদারের ছিলনা। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষক তার জমির উপর স্বত্বাধিকার হারালো। সে সঙ্গে জমিদারের সামাজিক সম্মান শতগুণ বেড়ে গেলো, কেননা এখন থেকে জমিদার তাঁর এলাকার একচ্ছত্র অধিততি, প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। সুতরাং

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে প্রত্যেক বিত্তবান লোক সামাজিকভাবে শক্তিমান হওয়ার উদ্দেশ্যে জমি কেনার জন্য শশব্যস্ত হয়ে উঠে। ক্রয়তব্য জমিদারীও তখন প্রচুর পাওয়া যেতো, কারণ, রীতিমত যাতে সরকারী রাজস্ব আদায় হয় সেজন্য সরকার সময়মত খাজনা অনাদায়ে জমিদারী নীলামে বিক্রি করে রাজস্ব আদায়ের কঠোর নীতি গ্রহণ করাতে হাজার হাজার জমিদারী অচিরেই ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে অগণিত প্রাচীন বনেদী পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং তাদের স্থান দখল করে নতুন বিত্তবানেরা।

কিন্তু রাতারাতি নায়েব, গোমস্তা, দালাল, মহাজন প্রভৃতি ব্যবসা থেকে জমিদার বনে গেলেও সামাজিক দৃষ্টিতে উক্ত নবাগতরা ছিলেন ভুঁইফোড় ও অবাঞ্ছিত। কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণ দিলে নবাগতদের সামাজিক পটভূমিকা বোঝা যাবে। যেমন, নতুন জমিদারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হুগলি জেলার দ্বারকানাথ বাবু। বাল্যকালে তিনি ছিলেন হুগলির প্রাচীন মল্লিক পরিবারের গৃহভৃত্য। প্রথম ডাকাতি করে এবং রেশমের ব্যবসা করে তিনি অগাধ অর্থোপার্জান করেন এবং সে অর্থ দিয়ে এমন এক বিরাট জমিদারী গড়ে তোলেন যার বাৎসরিক সরকারী রাজস্ব ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।[৫] নদীয়া জেলার রানাঘাটের প্রসিদ্ধ পাল-চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণচন্দ্র পাল প্রথম জীবনে পানের ফেরিওয়ালা ছিলেন। পরে খাদ্যশস্য ও লবনের ব্যবসা করে মহাবিত্তবান হয়ে উঠেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কয়েক বৎসরের মধ্যে নদীয়া ও যশোরে রাজাদের অধিকাংশ সম্পত্তিই ক্রয় করেন।[৬] সামান্য একজন তাঁতী হিসেবে জীবনযাত্রা শুরু করেন মুর্শিদাবাদ জেলার দানেশমান্দ নিত্যানন্দ। পরে হেষ্টিংসের যুগে তিনি রংপুরে কোম্পানীর মাসিক ৩৫ টাকা বেতনের বাণিজ্যিক এজেন্ট নিযুক্ত হন। সে থেকে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে বীরভূম, নাটোর ও দিনাজপুর রাজাদের বিশিষ্ট পরগনাসমূহ নীলামে ক্রয় করেন।[৭] বিখ্যাত কাশিমবাজার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কান্ত বাবু প্রথমে ছিলেন সাধারণ একজন মুদী দোকানী। পলাশীযুদ্ধের পর তিনি কাশিমবাজার ফেক্টরীর মুহুরী নিযুক্ত হন। পরে হেষ্টিংসের বেণিয়ান হিসেবে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেন

এবং কান্তনগর নামক সুবিস্তৃত জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন।[৮] কান্তবাবুর মত বাকরেগঞ্জ জেলারে মহা চন্দ্রদ্বীপ জমিদারীর ক্রেতা রামমানিকও ছিলেন মাধব পাশা বাজারের এক মুদী দোকানী।[৯] যশোরের প্রখ্যাত নড়াইল পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কালীশংকর প্রথম জীবনে ছিলেন একজন পেশাদার লাঠিয়াল। নাটোরের রাণী ভবানী ও তাঁর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের অনুগ্রহে তিনি ক্রমে ক্রমে নাটোর রাজের নায়েব পদে উন্নীত হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর প্রভুকে প্রতারণা করে জমিদারীর লাভজনক পরগনাগুলি বেনামীতে হস্তগত করেন।[১০] কলিকাতা-বাসিন্দা নব্য জমিদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, জয়নারায়ন ঘোষাল, রাধামোহন সাণ্ডাল, নবকৃষ্ণ দেব, অভয়চরণ মিত্র, জয়কৃষ্ণসিং, ঠাকুরদাস গোসাইন, কাশীনাথ বন্দোপধ্যায় প্রভৃতি। তাঁদের প্রত্যেকে জীবন যাত্রা শুরু করেন প্রায় খালি হাতে।

এই নব্য ভদ্রলোকেরাই হলেন ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের নববাবু বিলাসের চরিত্র। এদের তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন কি করে তাঁরা আর্থোপার্জন করেন, কি ভাবে সে অর্থ ব্যবহার করেন, কিভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন করেন এবং কিভাবে তাঁদের চালচলন সমাজে হ্যস্য-উপহাসের উদ্রেক করে। নব্যবাবুদের ধনের উৎস সম্পর্কে ভবানীচরণ লেখেন,

> ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুষ্ট নিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেবচক ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুর অধিক ধনী হত্তনের অনেক পন্থা করিয়াছেন। ···আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা [শহরে] আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্ম্মকার চর্ম্মকার চটকার পটকার মটকার বেতনভোগ হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারী চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া···অর্থ সঙ্গতি করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিম্বা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনঢ্য হইয়াছেন, ইহারা অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত।[১১]

ইংরেজ রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় বাঙালীর সমাজ ব্যবস্থায় শুধু সমাজের উচ্চবর্ণ ও উচ্চবংশের লোকদেরই লেখাপড়া ও চাকরী বাকরীর একচেটিয়া

অধিকার ছিল। নিম্ন বর্ণের ও নিম্নবংশের লোকেরা তাদের বর্ণগত পেশা ছেড়ে অন্য ব্যবসা ধরলে সমাজপতিরা তা সহ্য করতেন না। কিন্তু কোম্পানীর শাসনে বঙ্গীয় সমাজের বর্ণপ্রাচীরে গভীর ছিদ্র দেখা দিল, অর্থাৎ এবার ছোটলোকেরাও বড় কাজ করতে সাহস পেলো। এ হেন সামাজিক ফাটল সম্পর্কে লেখেন,

> অর্থকরী কিঞ্চিৎ বিদ্যোপার্জ্জনে স্বজাতীয় ধর্ম্ম হল বাহনাদি কর্ম্মে নিন্দিত তত্ত্ব বোধ করিয়া অধিক ধনাশাধীন স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া সংপ্রতি কৈবর্ত্তাদি নানা জাতীয় প্রায় অনেকেই অনেক স্থানে দৃষ্ট হইয়াছেন। পৃঃ ১১

অর্থকরী বিদ্যার অন্তর্গত ছিল মহাজনী ও জমিদারী হিসেব, কোম্পানীর আরজের হিসেব কায়দা ও সামান্য হাঁ-না করার মত ইংরেজী। দিকে দিকে স্থাপিত হলো অসংখ্য পাঠশালা যেগুলোর শিক্ষক প্রায়ই একাধারে ছিলেন মাস্টারমশাই, স্থানীয় মহাজন, দোকানদার, পোস্ট মাস্টার, এমনকি গোয়েন্দা পর্যন্ত। স্বভাবতঃই সংস্কৃত টোলের নির্মম শৃংখলা, অটল গুরুভক্তি ও শিক্ষালাভের একাগ্রতা ছিলনা। অর্থকরী পাঠশালাগুলোর পড়োয়ারা যেমন ছিল অধিকাংশই নব্যবাবু, উঠতি হবু বাবুদের পুত্র সন্তান, এগুলোর শিক্ষকবৃন্দও ছিলেন হরেক বর্ণের। টোলের পণ্ডিতের মত তাঁরা শিক্ষার্থীদের প্রচণ্ড বেত্রাঘাতে জর্জরিত করতেন না। বেত ব্যবহারে এ হেন কার্পণ্যের প্রতি ভবাণী ব্যঙ্গ করে বলেন,

> "বাবু সকল আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শিক্ষা করেন ইহাতে শিক্ষাকার যদ্যপি বাবুদিগের শরীরে স্বল্প বেত্রাঘাতাদি করেন কিম্বা ভয়জনক বাক্য কহেন তবে কর্ত্তামহাশয় রুষ্ট হইয়া কহেন শুন সরকার [শিক্ষক] তুমি বাবুদিগের শরীরে কদাচ বেত্রাঘাতাদি করিবানা আর ভয়জনক উচ্চভাষাও কহিবানা যেরূপ ক্ষুদ্র লোকের সন্তানদিগকে মারিয়া থাক সদা অনুনয় বিনয় বাক্যেতে তুষ্ট রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবা তুমি রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ কিছুই নীতিজ্ঞান নাই ভাগ্যবান লোকের সন্তান দিগকে বাবু বলিতে হয় সর্ব্বদা স্নেহ বাক্যে তুষিতে হয় তবে তাহারা সুমেজাজে লেখাপড়া অভ্যাস করে নতুবা মারপিট করিলে মেজাজ খারাপ হয়...শিক্ষাকার কহিলেন যে আজ্ঞা মহাশয় এক্ষনে তাহাই করিব। পৃঃ ১২-১৩।

ভবানীচরণ ভাবেন যে মাত্রাধিক প্রশ্রয় ও মাত্রাধিক ধনগর্বের ফলে ছোট-

বাবুরা যা শিখলেন তা সবই যৌন জাতীয়। কিন্তু বাবুদের পারিষদেরা তা স্বীকার করবেন না। নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মোসাহেববৃন্দ বাবুদের দরবারে বসে ছোটবাবুদের বিদ্যার গভীরতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার কথা বারে বারে উল্লেখ করেন। যথা,

> অমাত্যবর্গরা কহিলেন বাবুদিগের যে রূপ ও মেধা এরূপ প্রায় দৃষ্টচর নহে আমরা পাঠশালায় দেখিয়াছি অঙ্গের সঙ্কেত দেখাইবা মাত্র গ্রহন করিয়া থাকেন এবং শ্রবণ মাত্রই শ্লোক অভ্যাস করেন ইহারা মহাশয়ের নাম সম্ভ্রম ও কুলোজ্জল করিবেন···আপনাদিগের জাতিবিদ্যা আর এমনি এ বংশের গুন আছে না পড়িলেও বিদ্যা হয়...বাবুদিগের লেখা বিজ্ঞ ২ ইংরাজেও বুঝিতে পারেন না, এ সকল আপনার পুণ্য প্রকাশ, যেরূপ বিদ্যা হইয়া উঠিল অনুসন্ধান করিলে প্রায় এরূপ বিদ্যা ও বুদ্ধি পাওয়া ভার, আশীর্বাদ করি চিরজীবী হইয়া থাকুন, প্রাতবাক্য লেখক কহে এ মত বিদ্বান সন্তান বাঁচা ভার। পৃঃ ১৪—১৮

নব্যবাবুর টাকা আছে, অমাত্যদের বিদ্যাও আছে। সুতরাং বনেদি হালচালে চলাতে আপত্তি কি? বনেদি কায়দায় বাবুগণ পালকি পেয়াদা ছাতা পিনীস পানসী গাড়ি জামা-জোড়া চাপকান পাজামা, পাপেষ পাগড়ী আমামা, লাড্ডুদার মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি তৈরি করেন এবং প্রত্যহ কুঠিতে গিয়ে সাহেবকে সালাম ঠুকে আসেন। প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর বনেদিরা দরবারে বসেন, গান বাজনা শুনেন, নাচ দেখেন। বাবুদেরও তা চাই। তাঁদের বৈঠকখানার বিবরণ দিয়ে ভবানী বলেন,

> বাবু বৈঠকখানায় চমৎকৃত হস্ত পরিমিত উচ্চ গদির উপরে বসিলেন কাহার দুই কাহার চারি পাশ বালিশ আছে, পিতলবান্ধা কেহ বা রূপা বান্ধা, কেহ সোনাবান্ধা হুঁকাতে, কেহ গুড়গুড়িতে, কেহ বা আল-বোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন. পানের বাটা থাকেন মধ্যে মধ্যে বাম হস্তে দুই একটা মসলা বদনে [দেন]। নানাবিধ খোসা-মোদে তোষামোদে বয়ামুদে বহুলে রমণী মেলক গাওক বাদক নর্ত্তকনর্ত্তকী

ভণ্ড প্রতারক এয়ার উমেদওয়ার দালাল মহাজন নবীন বাবুদিগের নাম শুনিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন। পৃঃ ১৯।

বাবুর সামাজিক সম্মান প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বাগানবাড়ী করতে হবে, দুর থেকে বিশেষ করে হিন্দুস্থান থেকে নাচিয়ে গালিয়ে আনতে হবে, ভাল খেতে হবে, বারাঙ্গনায় বাড়ী ভরপুর করতে হবে। কারণ এসব প্রাচীন বনেদিদের রীতিনীতি। তাই নব্য বাবু বন্ধু বান্ধব মোসাহেব,

সঙ্গে কখন বাগানে কখন নিজ ভবনে নানা জাতি প্রমোদিনী বিবিধ বিলাসিনী বারাঙ্গনা আনয়ন পূর্ব্বক আপন [মন] খুসি করিতেছেন। বাবুর খাবারের জন্য নায়েব গোমস্তারা ব্যবস্থা করিতেছেন শত শত মদ্যমাংস মণ্ডামিঠাই মতিচুর খাজাগজা সরভাজা অতি সুমধুর কাঁচাগোল্লা বাতামতক্তি আতা অনুপম বঁদে মোহনভোগ মনোহারা অনুত্তম। জনায়ের রসকরা মুড়কি খাকড়ার অতি অনুপম মুণ্ডি ফরাসডাঙ্গার খৈচুর শান্তিপুরের মোয়া বর্দ্ধমানের ওলা বীরভূমের নবাত মেওয়া। পৃঃ ২৯-৩২

নব্যবাবুরা বাগানবাড়ীতে গিয়ে যে অমোদ তামসা ভোগ করতেন তার এক দৃশ্যের বর্ণনা দেন ভবানীচরন। তিনি বলেন,

"হিন্দু মুসলমান বেশ্যা সাধারণ তাবতেই নির্ম্মলান্তকরণে একাসনে বিবিধ মদ্য মাংস প্রভৃতি নানা দ্রব্য ভোজন করিলেন, তৎপর নানাবিধ মসলা সম্বলিত তাম্বুল ভোজন অন্তর নানা প্রকার তামাকের আয়োজন। কড়া দোক্তা ভেলস অম্বুরি গাঁজা খায় কেহ চরস খায় কেহ বলে হায় হায় কেহ নৃত্য করে কেহ তাড় মারে কেহ হাসিছে কেহ কান্দিছে কেহ খেলিছে কেহ দুলিছে কেহ পড়িছে কেহ বলে বড় মজা ওহে তুমি এয়ারের রাজা, কেহ বলে মেদরা বুঝি অল্প আসিয়াছিল হিঙ্গল বি বি বসাক বাবু এইদুই জনে সকলই খাইল, কেহ ঘরে ঢুকিল, কার্ক খুলিয়া সরাপ ছয়লাপ করিল, কেহ মৎস্য ধরে কেহ গুপ্ত ঘরে, কেহ মজিয়াছে কালোয়াতের গানে, কেহ বেশ্যামুখ চুম্বনে কেহ আলিঙ্গনে কেহ স্তন মর্দ্দনে কেহ বলে তয়ফাওয়ালী কি মজা দিলি, এইরূপ খুসিতে স্বদেশী সকলেই নববাবুর মনোভিলাস পূর্ণ করিলেন, এই প্রকার রাগ রঙ্গে দিবারাত্রি গত হইল প্রভাতে তাবতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। পৃঃ ৩৫।

তৎকালীন সাহিত্য, পত্রিকা, সরকারী নথিপত্র দেখলে নব্যবাবুদের জীবন-কায়দা সম্পর্কে ভবানীচরণ যে চিত্র এঁকেছেন তা অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত ও অশালীন ঠেকলেও অতীব সত্য বলেই গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এটাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে নতুন ভদ্রলোকের প্রতি প্রাচীন বনেদীরা পোষণ করতেন চরম ঈর্ষা ও তৎপ্রসূত অবহেলা, ঘৃণা ও সহভাবের একান্ত অনিচ্ছা। নব্য ধনাঢ্য শ্রেণী জমিজমা, তালুকমুলুক কিনছেন বটে, কিন্তু তত সহজে সামাজিক স্বীকৃতি পাননি। যদিও বৃটিশ শাসনে পুরনো অভিজাত শ্রেনী অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট শক্তি হারিয়েছ কিন্তু তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি বিশেষ হ্রাস পায়নি। তাঁরা নবাগতদের তাঁদের সমপর্যায়ে স্থান দিতে ছিলেন মনে প্রাণে অপ্রস্তুত। এ নীতির পেছনে সামাজিক বিষয় ছাড়া রাজনৈতিক কারণও ছিল। সরকারী খাজনা রীতিমত অনাদায়ে নীলামে জমিদারী বিক্রী করে রাজস্ব আদায় করার অভূতপূর্ব ব্যবস্থাকে জমিদারেরা তাদের প্রতি নিদারূণ অন্যায় ও শত্রুতামূলক আচরণ বলে মনে করেন এবং যারা ওসব জমি নীলামে কিনে সরকারের সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে সামাজিক শত্রু বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সরকার যেহেতু নবাগতদের পেছনে ছিল, জমি ও সমাজ থেকে এদের উৎখাত করা সম্ভব ছিলনা, কিন্তু লোক চোখে এদেরকে হেয় প্রতিপন্ন কর খুবই সম্ভব ছিল। তাই অন্ততঃপক্ষে প্রথম পুরুষ পর্যন্ত নতুন জমিদারের পরিচয় ছিল অমুক জমিদার বা চৌধুরী নয়, বরং অমুক নিমক বাবু অর্থাৎ যিনি নিমকের ব্যবসা করে বিত্তবান হয়ে জমিদারী কিনেছেন। এমনি করে, চটবাবু, মুদিবাবু, ঠিকাবাবু, ডাকুবাবু, তেলিবাবু, কসাইবাবু, রেশমবাবু, ইত্যাদি। উক্ত বাবুরা রাইয়তের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারতেন বটে কিন্তু আনুগত্য আদায় করতে পারতেন না। তাদের আনুগত্য ছিল সে পুরাতন রাজবাড়ী, রায়বাড়ী, চৌধুরী বাড়ীর প্রতি, যদিও তাঁদের শূন্য নামটি ছাড়া আর কিছুই বিশেষ ছিলনা। শতাব্দীর সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার ফলে জন-সাধারণের মানসিকতা এমনিভাবে গড়ে উঠেছিল যে এরা ভাবতেই পারতনা যে মহাপরাক্রমশালী সামাজিক শাসকগোষ্ঠীর পতন হতে পারে এবং তাঁদের

ব্যতিরেকে সমাজে শান্তি শৃংখলা বজায় থাকতে পারে। যেমন, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুরী লেখেন যে, দেশে যে-ধর্মহীনতা ও কলির যুগ বিরাজ করছে এর অকাট্য প্রমাণ হলো নদীয়ার রাজার পতন। তিনি লেখেন,

নবদ্বীপ অধিপতি নৃপতির চূড়া
ইন্দ্রচন্দ্র দ্বারে খেয়ে গেছেন হুড়া।
সকল নিলেন লুটে পুটে
রাখালো না তার গুড়া।
আজি শুদ্রেতে বেদ পড়ে বামন হলোভেকো।
ছত্রিশ বর্ণ এক হলো তার সাথী হুকো।
শ্বশুরে পুত্রবধু হরে বাবা হরে ঝি।
ইহা দেখে পাখী বলে দেশের হবে কি ? [১২]

কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের পথে যত বাধাই আসুকনা কেন, নব্যবাবুরা ছিলেন নাছোড়বান্দা। তাঁদের অর্থ আছে, আছে সরকারের সমর্থন। অর্থ দিয়ে যেমন জমিদারী কিনেছেন তার সংলগ্ন সম্মানটুকুও যে অর্থ দিয়েই কিনতে হবে তা অনুভব করতে তাঁদের মোটেই দেরী হলোনা। অগণিত টাকা খরচ করে তাঁরা পূজাপার্বন ও নানা সামাজিক উৎসব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ওসব উৎসবে পুরান বনেদীরা যা খরচ করতেন তার দশগুণ বিশগুণ খরচ করে সমাজের ভক্তি অর্জন করতে চেষ্টা পান।[১৩] বাড়ীতে প্রয়োজ নাতিরিক্ত শসস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করলেন, কোমরে রূপার তরবারী ঝুলালেন, দিকে দিকে মঠমন্দির নির্মান করলেন, গঙ্গার তীরে ঘাট বেঁধে দিলেন, ব্রাহ্মণকে ভোজন দিলেন, টাকা দিলেন আর দিলেন নিষ্কর ভূমি।[১৪] জম জমাট পূজ-পার্বণ, দান দক্ষিণা, জনহিতকর কার্য করলে জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায়, কিন্তু সত্যিকারের আভিজাত্য লাভ করতে হলে আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন, যথা, একখানা মনোরম বাগানবাড়ী, হিন্দুস্থানী বাইজি ও গানের ওস্তাদ, ইয়ার দুস্ত নিয়ে শিকারে গমন ইত্যাদি। নব্য বাবুরা সব শর্ত মেনে নেন। প্রাচীন বনেদীদের চলোফেরার কায়দা, রুচিবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছু নির্বিচারে ও নির্ভেজালভাবে গ্রহন করলেন।[১৫]

নব্যবাবুদের দানশীলতা, বদান্যতা, ধর্ম কর্মে আগ্রহ ব্রাহ্মন পালনে অকৃপণতা জনহিতকর কার্য ইত্যাদি ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জনে সাহায্য করে। সামাজিক মর্যাদালাভে অর্থের এহেন সাফল্য দেখে প্রাচীন বনেদীদের ঈর্ষার আগুন আরও জ্বলে উঠে। ১৮২৩ সালে গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা কালে এক প্রস্তাবে বলা হয় যে দিনকাল এমনিভাবে বদলে গেছে যে পূর্বে যেখানে সামাজিক সম্মানলাভে অর্থের বিশেষ মূল্য ছিলনা বর্তমানে সেখানে অর্থ দিয়েই সম্মান আভিজাত্য কেনা হচ্ছে।[১৬] উক্ত গৌড়ীয় সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একই বৎসরে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর 'নব-বাবু বিলাস'। তিনি নতুন সামাজিক শাসকশ্রেণীর চালচলন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এমনভাবে অংকিত করেছেন যে মনে হয় নব্যবাবুরা তাঁদের নিন্দনীয় ব্যবহার সমাজ কলেবরে প্রথম আমদানী করেছেন। তাঁর বর্ণিত নববাবুরা লেখাপড়া জানেন না, ছোট বেলা থেকে লেখাপড়া ছেড়ে তাঁরা ইয়ার-দুস্ত-মোসাহেব নিয়ে ইতরজনোচিত কাজে লিপ্ত বাইজি-বেশ্যা নিয়ে নাচগান করেন, মদ্যপান করেন ইত্যাদি। বস্তুতঃপক্ষে এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল ঐতিহাসিক সামন্ত পরিবারগুলির মধ্যে বিশেষভাবে ব্যাপ্ত। নব্যবাবুরা সামন্ত সমাজের সদস্য হয়ে এগুলো অনুকরণ করেছিলেন মাত্র। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাঙলার মহা সামন্ত পরিবারগুলির মধ্য একমাত্র নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ লিখতে পড়তে পারতেন আর বাকীরা প্রায়ই নিরক্ষর এবং বাইজি বেশ্যা নিয়ে ভোগ বিলাসই ছিল তাঁদের দৈনন্দিন জীবন।[১৭] তাছাড়া বর্তমানে বাইজি-বেশ্যা বৃত্তিকে যে নজরে দেখা হয় অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের প্রথমে এ দৃষ্টিতে দেখা হতোনা। তখন বাইজি বেশ্যারা খুব একটা ঘৃণার পাত্রী ছিলনা। বরং সম্মান করে শুধু বাই না বলে তাকে ডাকা হতো বাই-জি বলে। যেমন বাবাজি, বাপুজি, ও ওস্তাদজি, গুরুজি ইত্যাদি। বেশ্যাগমন তখন ছিল এক অতি সাধারণ ব্যাপার। নদীয়ার রাজার দেওয়ান কার্ত্তি কেয় চন্দ্র রায় তাঁর স্বচক্ষে দেখা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন,

তৎকালে বিদেশে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে

> প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে গ্রীস দেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্ব্বোপলক্ষে তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।[১৮]

সুতরাং বেশ্যালয়ে গমন বা নিজবাড়ীতে বেশ্যা পালন নববাবুদের এক-চেটিয়া বিছু ছিলনা। এ রোগ সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত ছিল বলা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে. ভবাণীচরণের 'নববাবু বিলাস' ব্যঙ্গ রচনাটি কোন অভিনব সামাজিক ব্যাধিকে কটাক্ষ করে লিখা হয়নি। প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর যে অভ্যেস ও রুচিবোধ' তার নির্বিচার নকলে প্রবৃত্ত হয়েছিল নব্যবাবুরা। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বনেদীদের চোখে এ ছিল সহ্যের বাইরে। গতদিনের তাঁতী, মুদী, চটকার পটকার রাজা মহারাজাদের সমকক্ষ হয়ে দরবার বসাবে, হিন্দুস্তানী বাইজী-ওস্তাদ নিয়োগ করবে, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আলবোলা টানবে, এ যেন তাঁদের কাছে বাগদী হয়ে বেদ পড়ার মতই মর্মান্তিক ঠেকেছিল।

উপসংহারে, ভবাণীচরণ বন্দ্যোপধ্যায় ছিলেন একজন রক্ষনশীল এবং সামন্ত-বাদী সমাজের সমর্থক। চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থার যে কোন পরিবর্তনের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। ইংরেজ শাসনের প্রথম পঞ্চাশ বৎসরে বাঙালী সমাজ ব্যবস্থায় যে বিরাট ওলট পালট হলো তার ফলে সামাজিক নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব শুরু হয় প্রাচীন সমাজপতি ও নবাগতদের মধ্যে। সে দ্বন্দ্বে ভবাণীচরণ প্রাচীন বনেদী শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং সমস্ত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তিশালী কলম ব্যবহার করেন। নববাবু বিলাস লিখেই তিনি ক্ষান্ত হননি। এরপর তিনি লিখেন 'কলিকাতা কমলালয়, 'নববিবি বিলাস' ও 'দূতী বিলাস।'

এ সবই ছিল নব্য ধনাঢ্য সম্প্রাদায়ের বিরুদ্ধে লেখা। তৎকালীন বাঙালী সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে বঝার জন্যে এ বোইগুলোর মূল্য অপরিসীম।

১। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য,
আবদুল করিম—Murshid Quli Khan and his Times ;
সিরাজুল ইসলাম—The Permanent Settlement and the Landed Interests of Bengal, 1793—1819 ; Unpublished Ph.D. thesis,London,1971
ওয়ারেন হেস্টিংস—Review of the State of Bengal. 1786

২। সিরাজুল ইসলাম, ঐ পৃঃ ১১৪—১২১।

৩। The Friend of India (Qurterly, series) October, 1825, P. 289.

৪। দ্রষ্টব্য, P.S. Marshall, "Indian officials under the East India Company in Eighteenth Contury Bengal, Bengal Past and present ; 158, part 2, July-Dec. 1965.

৫। প্রথম নাথ বর্ম্মা, দ্বারকানাথ বাবুর জীবন চরিত, কলিকাতা ১৮৬০ পৃঃ ২-৩, ৭-৮, ১০, ১৫।

৬। সিরাজুল ইসলাম, ঐ পৃঃ ৪০২।

৭। Francis Buchanan Papers vol I, Book I, Pp. 35-6, MSS. EUR D.74 (India office Records)

৮। গোকুলনাথ ধর, "কৃষ্ণকান্ত নন্দী," Bengal Past and Prsent, january-Jnne, 1924, vol.27, P.182

৯। Henry Beveridge, The District of Bakargonj, London 1876, p. 871

১০। J.Westland, A Report on the District of jessore, Calcutta 1871, Pp. 7, 201—6.

১১। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নববাবু বিলাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩৪৪, পৃঃ ১০। (এখন থেকে শুধু পৃষ্ঠার উল্লেখ থাকবে)।

১২। মহাকবি রসসাগরের জীবনচরিত, পৃঃ 88 (India office vern-tract 2013) কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী তাঁর রসসূচক রচনার জন্যে নদীয়ার রাজার কাছ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন "মহাকবি রসসাগর"।

১৩। Friend of India, 24 Sept. 1835, vol.1, p. 305, 30 April 1835, vol. 1, p.137.

১৪। সিরাজুল ইসলাম, ঐ, পৃঃ ৩৩১-৩৬৪।

১৫। ঐ,

১৬। গৌড়ীয় সমাজ, (প্রতিষ্ঠা বিবরণী) ৬ ফাল্গুন ১২২৯।

১৭। Bedufoy's Report, Wellesley Papers Add.1271, Pp,67—68, (British Musenm,

১৮। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্ররায়ের আত্মজীবন চরিত। নূতন সংস্কারক কলিকাতা ১৩৬৩, পৃঃ ৪২।